একক ১৫ ❑ নব্য-উপনিবেশবাদ এবং নতুন নিয়ন্ত্রণ নীতি

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ নব্য উপনিবেশবাদ ঃ সংজ্ঞা

১৫.৪ নব্য উপনিবেশবাদের প্রসার ঃ ঐতিহাসিক ধারা

১৫.৫ নব্য ঔপনিবেশিক শোষণ ঃ অর্থনৈতিক

১৫.৬ নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ঃ সাংস্কৃতিক

১৫.৭ সারাংশ

১৫.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১৫.৯ উত্তরমালা

১৫.১০ অনুশীলনী

১৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আপনাকে অধুনা উন্নয়নশীল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অন্যতম আধুনিক সমস্যা, ‘নব্য-উপনিবেশবাদ’ সম্বন্ধে অভিহিত করবার উদ্দেশ্য রচিত হয়েছে।

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- উপনিবেশবাদ এবং নব্য-উপনিবেশবাদের পার্থক্য।
- নব্য-উপনিবেশবাদের অর্থ।
- নব্য-উপনিবেশবাদের উদ্ভব, প্রসার এবং আধুনিক প্রকৃতি।
- নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের ধারা—অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য।
- উন্নয়নশীল বিশ্বে নব্য-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রসার এবং দেশীয় প্রভাব এবং সংস্কৃতির ধ্বংসসাধন।

১৫.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে, এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করলেও, এই দেশগুলি অর্থনৈতিক

এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এত দুর্বল থাকে যে, তাদের প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা তাদের ওপর পরোক্ষভাবে, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এই পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বলা হয় 'নব্য-উপনিবেশবাদ' 'Neo-Colonialism'। এই এককের অন্যান্য অংশে এই নব্য-উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং বিশ্বব্যাপী প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পড়ে আপনারা আরো জানতে পারবেন যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, নব্য-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি কীভাবে নব্য-উপনিবেশগুলির ওপর নিজেদের আচার এবং সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়, যা তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

১৫.৩ নব্য-উপনিবেশবাদ ঃ সংজ্ঞা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে, বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ঠাণ্ডা যুদ্ধের (Cold War) আরম্ভ এবং বিশ্ব রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের (Third World) উত্থান। ১৯৪৫-১৯৭০ সালের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা মিলিয়ে, প্রায় ৬৬টি উপনিবেশ, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয় বিশ্বের এই মুক্তিলাভ প্রক্রিয়াকে প্রত্যেকেই স্বাগত জানান। ঠাণ্ডা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুই গোষ্ঠী, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রমী ছিল না। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই দেখা গেল যে, উপনিবেশগুলির, তাদের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের ওপর নির্ভরতা বজায় আছে, বা কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়ে যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হল প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্বলতা। প্রধানত কৃষি পণ্য এবং কাঁচামাল যোগানকারী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, স্বাধীনতার পূর্বে, শিল্পদ্রব্য এবং মূলধন বা পুঁজির যোগানের জন্য মূলত, তাদেরসাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরও তাদের এই নির্ভরতা বজায় থাকে। নতুন মূলধন যোগানকারী বা ঋণদানকারী সংস্থাগুলি, যেমন বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) বা, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (International Monetary Fund, I.M.F.) ছিল প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রথম বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে। তাই এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে ঋণদান বা বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্য করে, বা কখনো সরাসরিভাবে আর্থিক সাহায্য, ঋণদান, শিল্পদ্রব্য রপ্তানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম হয়। এখানে মনে রাখা উচিত যে, নব্য-উপনিবেশবাদ শুধুমাত্র বিশ্বেরই নিয়ন্ত্রণ নীতি ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় সরাসরি বাহিনী পাঠিয়ে, এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায়, প্রথম বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, নব্য-উপনিবেশবাদ ছিল আরো ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। তাই, নব্য উপনিবেশবাদ বলতে আমরা মূলত, প্রথম বিশ্ব-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির কথাই আলোচনা করব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের উত্থান এবং নব্য-উপনিবেশবাদ সমস্যা প্রকট হলে সমাজ বিজ্ঞানীদের (Social Scientists) বিভিন্ন গোষ্ঠী এর সংজ্ঞা নিরূপণ, ব্যাখ্যা এবং এর প্রতিকারের উপায় সন্ধানে সচেষ্ট হন। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল 'নব্য' মার্কসীয় (Neo-Marxist) গোষ্ঠীর। রাজনৈতিক বিজ্ঞান এবং আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক আলোচনায় এই গোষ্ঠীভুক্ত পণ্ডিতরা মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগ করে, একটি নতুন ধারার উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হন। নব্য-মার্কসীয় গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্ব রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলির ওপর প্রথম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দেখানো। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে, তাঁরা একটি নতুন তত্ত্ব প্রয়োগ করেন, যার নাম 'নির্ভরতা তত্ত্ব' (Dependency Theory)। নব-মার্কসীয় মতে তৃতীয় বিশ্বের, প্রথম বিশ্বের ওপর এই নির্ভরতার পেছনে রয়েছে, অন্তর্দেশীয় সম্পর্কের কিছু কাঠামোগত (Structural) ত্রুটি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রথম বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে 'কেন্দ্র' (Centre) হিসাবে অভিহিত করা হয়। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি হলো 'প্রান্তিক' (Periphery) অঞ্চল।

তৃতীয় বিশ্বের 'প্রান্তিক' রাষ্ট্রগুলি, একদা উপনিবেশ হিসেবে 'কেন্দ্রীয়' সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে কৃষি পণ্য এবং শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের যোগান দিয়ে এসেছে। পরিবর্তে, তারা অনেক অধিক দামে শিল্পদ্রব্য এবং ঋণ করতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, 'প্রান্তিক' দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করলেও, তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা কোন অংশে কমেনি। নব্য-মার্কসীয় মতে, অন্তর্দেশীয় সম্পর্কে কাঠামোগত (Structural) পরিবর্তন না ঘটলে এই শোষণ অব্যাহত থাকবে। নব্য-মার্কসীয় 'নির্ভরতা তত্ত্ব' আরো সহজ করে বোঝানোর জন্য নিচে একটি সূত্র দেওয়া হলো।

'নির্ভরতা তত্ত্ব'—সাম্রাজ্যবাদ—প্রথম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের সম্পর্ক নব্য-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গী করে, অনেক সমাজ বিজ্ঞানী তৃতীয় বিশ্বের এই আধুনিক সমস্যা নিয়ে লিখতে শুরু করেন। এই লেখককুলের মধ্যে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো।

১। ফ্রানজ্ ফ্যানন্—'এই বিশ্বের হতভাগ্যরা'।
Frantz Fanon—'The Wretched of the Earth'.

২। কোয়ামে নক্রুমা—'নব্য-উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শেষ অধ্যায়'।
Kwame Nkruma—Neo-colonialism-the last stage of Imperialism.

৩। ওয়াল্টার রডনী—'ইউরোপ কিভাবে আফ্রিকাকে অনুন্নত করেছে'।
Walter Rodney—'How Europe Underdeveloped Africa'.

এই লেখককুলের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলেন ঘানার রাষ্ট্রপতি এবং আফ্রিকার এককালীন ঐক্য আন্দোলনের নেতা, কোয়ামে নক্রুমা। নক্রুমার নব্য-উপনিবেশবাদের ওপর লেখা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। এই গ্রন্থে, নক্রুমা দেখিয়েছেন যে কিভাবেনব্য-উপনিবেশবাদকে কেন্দ্র করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। নক্রুমার মতে, "আজকের নব্য-উপনিবেশবাদ হলো সাম্রাজ্যবাদের শেষ এবংবোধ হয় সবথেকে বিপজ্জনক অধ্যায়"—("The noe-colonialism of today represents imperialism in its final and perhaps its most dangerous stage"). কোয়ামে নক্রুমা 'নিও কলোনিয়ালিজম ঃ দ্য লাষ্ট স্টেজ অফ ইম্পিরিয়ালিজম'। (পৃঃ IX), নেলসন পাবলির্শাস। ১৯৬৫, (Kwame Nkrumah—'Neo-colonialism : The last stage of Imperialism (Pg. IX). Nelson Pub. 1965)

নক্রুমাও নব্য-উপনিবেশবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানত, তৃতীয় বিশ্বে অবস্থিত দেশগুলির অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং দুর্দশার কথা লিখেছেন। অর্থনৈতিক শোষণ নব্য-উপনিবেশবাদের প্রধান প্রকৃতি হলেও অন্যান্য লেখকরা, অন্য কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, জাঁ পল সার্ত্র (Jan Paul Sarte) যেমন দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে কীভাবে বিভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতি

এবং লোকসংস্কৃতি ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে অন্য অনেক লেখক এই ধরনের সাংস্কৃতির সাম্রাজ্যবাদ (Cultural Imperialism) সম্বন্ধে লিখেছেন। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা, ১৫.৬ অংশে করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী ঃ

১। নব্য-সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝেন?

১৫.৪ নব্য উপনিবেশবাদের প্রসার—ঐতিহাসিক ধারা

নব্য-উপনিবেশবাদ কথাটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায়, ১৯৬১ সালে। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকে, এই তত্ত্বের ব্যবহার সমাজ বিজ্ঞানী মহলে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আরো দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নব্য-উপনিবেশবাদের উত্থান, আরো আগে, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই নীতির প্রধান উদ্ভাবক ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে রেষারেষির ফলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তিত এই নীতি লক্ষ্য করা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তীব্র সমালোচনাও করে। কিন্তু তার পরিবর্তে মার্কিন সরকার, আর্থিক অনুদান ও সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকা এবং কিউবার ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়। এই নীতিই পরবর্তীকালে আরো ব্যাপকভাবে নব্য-উপনিবেশবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নব্য-উপনিবেশবাদের প্রথম প্রয়োগ আমরা কিউবায় দেখতে পাই। ১৮৯৯ পর্যন্ত কিউবা স্পেনের উপনিবেশ ছিল। ১৮৯৯ সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও অমিত শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ওপর অধিকার বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। ১৯০২ সালে এই নব্য-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন কিছুটা প্রতিহত হলেও, ১৯০৯ সাল থেকে মার্কিন আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিউবায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হওয়া পর্যন্ত বজায় থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য অনেক দেশেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৯০৩ সালে পানামার নবনিযুক্ত স্বাধীন সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন সরকার, গুরুত্বপূর্ণ পানামা খাঁড়ির (Panama Canel) ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক অনুদানের মাধ্যমে, লাতিন আমেরিকার অন্য দেশের যেমন ডোমিনিক প্রজাতন্ত্র, ব্রাজিল, হাইতি দ্বীপপুঞ্জ, আর্জেন্টিনা এবং চিলি প্রভৃতির ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়।

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত অবশ্য নব্য-উপনিবেশবাদ সেভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি এবং মূলত দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিন আধিপত্য বিস্তার নীতিতেই আবদ্ধ ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিন্তু, এই ধারা আরো ব্যাপক আকারে, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্তারের পেছনে মূল কারণ ছিলো দুটি—(১) তৃতীয় বিশ্বের উত্থান এবং (২) ঠান্ডা যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার ফলে, যুদ্ধ শেষে দেখা যায় যে ইউরোপীয় দেশগুলি যাদের অধিকাংশ

ছিল সাম্রাজ্যবাদী তারা অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দুর্বলতার ফলে তাদের উপনিবেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। এছাড়া, এই সময় উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা তীব্র হয়ে উঠেছিলো। এর ফলে, এশিয়া এবং আফ্রিকা সহ দেশের বিভিন্ন উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ নীতির বিরোধী ছিলো। তাই তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতার আন্দোলন তাদের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু অপরদিকে, ১৯৪৫-এর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্ব-রাজনীতিতে নিজেকে আরো ব্যাপকভাবে অংশীদার করতে শুরু করে।

বিশ্ব রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার এই তাগিদ প্রধানত দেখা দেয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতার লড়াইয়ের মূল রঙ্গভূমি হয়ে ওঠে, ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ। পূর্ব ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের আধিপত্য বিস্তার করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, পশ্চিম ইউরোপে নিজের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। এবং এই আধিপত্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক অনুদান। দেশীয় পর্যায়ে ঋণদান ছাড়া, নতুন গঠিত প্রতিষ্ঠান, যেমন—বিশ্বব্যাঙ্ক বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ছিলো প্রধানত মার্কিন মূলধন নিয়ে গঠিত। পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, একদা ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিতেও নিজেদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। এর একটি কারণ ছিলো এশিয়া এবং আফ্রিকার কাঁচামাল রপ্তানী এবং বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ। অপর কারণ ছিলো, সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বা উন্নয়নের পথে। বাধা সৃষ্টি করা, যাতে এই দেশগুলির ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য না বিস্তার পায়।

নব্য সাম্রাজ্যবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পরোক্ষভাবে বা প্রধানত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিকশিত হলেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের পটভূমিকায় 'শক্তি-রাজনীতি' বা 'Power Politics', সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না। নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করবার লক্ষ্যে প্রয়োজন মতন সামরিক শক্তিরও ব্যবহার করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। জাপানে মার্কিন সামরিক অবস্থান অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সরে যাওয়ার পর ভারত মহাসাগরে, দিওগো গার্সিয়া (Diego Garcia) দ্বীপে, মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার অন্যান্য দেশে, যেমন—ফিলিপিনসে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পর মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম এশিয়াতে নব্য-উপনিবেশবাদের মূল লক্ষ্য হয় এই অঞ্চলে তেল এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ। এইখানেও, মার্কিন সৈন্য ঘাঁটি কিছু কিছু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্রিকার বহু দেশে মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারিত হয়। সামরিক ঘাঁটি ছাড়া বহু জায়গায় স্বৈরতান্ত্রিক সরকার মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়।

১৫.৫ নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণ ঃ অর্থনৈতিক

নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের অন্যতম ধারা হলো অর্থনৈতিক শোষণ। এই অংশে আমরা এই অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

নব্য-ঔপনিবেশিক নীতির সরাসরি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হলো ঋণ এবং আর্থিক অনুদান। সরাসরি দেশীয় ভিত্তিতে ঋণদান এবং অনুদান ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে বিশ্বব্যাঙ্ক বা আই.এম.এফ.—এই ঋণ বা

অনুদান প্রকল্পগুলি চালিত হয়। ঋণগ্রহণকারী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে দুটি আবশ্যিক শর্ত পালন করতে হতো। প্রথমটি হলো সমাজতান্ত্রিক মডেল না মেনে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উন্নয়নের এই মডেলটি দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। অধিকাংশ লভ্যাংশ পুঁজিবাদের হাতে গচ্ছিত থাকছে, জনসাধারণ তার সুফল ভোগ করছে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ব্রেজিলের কথা এখানে বলতে পারি। ১৯৬০ দশকের শুরুতে, ব্রেজিল বিশ্বের অন্যতম ঋণী রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বের কাছ থেকে অবাধে ঋণগ্রহণ করা সত্ত্বেও কিন্তু, ব্রেজিলের অর্থনীতি দ্রুতহারে বিকশিত হয়নি। অধিকাংশ বিনিয়োগ ঘটে ভোগ্যপণ্য শিল্পে, ভারী শিল্প বা পরিকাঠামোয় নয়। তাই প্রচুর ঋণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্রেজিলের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দুর্বল হয়েই থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হলো নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি পাওয়া। ব্রেজিলের মত উদাহরণ, এশিয়া এবং আফ্রিকার আরো অনেক দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ এবং অন্যান্য অনুদান যে আসলে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার সেটা ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকটের ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যায়। মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের, প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহায্যে মাধ্যমে, নীল নদের ওপর আসওয়ান (Aswan) বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প শুরু করলেও, অচিরেই সাহায্যকারী দেশগুলির সঙ্গে নাসেরের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের মূল কারণ ছিলো, নাসের দ্বারা, সোভিয়েত সমর্থিত দ্বিতীয় বিশ্ব গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং অস্ত্র ক্রয়কে কেন্দ্র করে। নাসেরের এই নীতির বিরোধিতা করে, সাহায্যকারী গোষ্ঠী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং বিশ্বব্যাঙ্ক)। আসওয়ান প্রকল্পে সাহায্য অনুদান বন্ধ করে দেয়। এর জবাবে নাসের সুয়েজ খাঁড়ির জাতীয়করণ করলে, সুয়েজ সংকট দেখা দেয়।

১৯৫০ দশকের সুয়েজ সংকট, এটা পরিষ্কার করে দেয় যে, প্রথম বিশ্বের দ্বারা তৃতীয় বিশ্বকে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ এবং অনুদান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং এই নিয়ন্ত্রণ নীতি আবার ছিলো ঠাণ্ডা যুদ্ধের মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত।

ঋণ এবং অনুদানের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রথম বিশ্বের যে অর্থনীতিবিদরা জোরদার সওয়াল করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডব্লিউ. ডব্লিউ. রস্‌টো (W. W. Rostou) ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গ্রন্থে 'দ্য স্টেজেস অফ ইকনমিক গ্রোথ ঃ এ নন কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'। (The Stages of Economic Growth : A Non-Communist Manifesto)। রস্‌টো লেখেন যে একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি যদি সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ এবং অনুদান লাভ করে এবং তার সদ্-ব্যবহার করতেসক্ষম হয় তবে সেই অর্থনীতি দ্রুতহারে উন্নত হতে সক্ষম। প্রথম বিশ্বের তৎকালীন অনেক সরকারেরকাছে, রস্‌টোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এবং ১৯৬০-র দশকে, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে এই নীতি অনুসারে, ঋণ দান শুরু হয়।

রস্‌টোর এই মডেল অবশ্য, তৃতীয় বিশ্বে আশানুরূপ উন্নয়ন আনতে ব্যর্থ হয়। সামান্য যা উন্নয়ন ঘটে, তার ফল তৃতীয় বিশ্বে অবস্থিত সমাজের উচ্চবর্গ ভোগ করে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের সেরকম কোন অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটেনি। এছাড়া, ক্রমাগত ঋণ এবং অনুদান গ্রহণ করার ফলে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলি ঋণজালে (Debt trap) জড়িয়ে যায় ; যার ফলে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংকট

দেখা দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৫০-১৯৮০'র মধ্যে ক্রমবর্ধমান মার্কিন আধিপত্যের ফলে, দক্ষিণ আমেরিকার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ব্রেজিলের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এছাড়া আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, পেরু, মেক্সিকো, চিলি, কলম্পিয়া, পানামা প্রভৃতি দেশগুলিও মার্কিন অর্থনৈতিক এবং সামরিক আধিপত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ঋণ এবং অনুদান, দক্ষিণ আমেরিকার মূল সমস্যাগুলি দূরকরতে অসফল হয়। কোনপ্রকার বিপ্লব ঠেকানোর লক্ষ্যে দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশেই, মার্কিন সরকার, প্রতিক্রিয়াশীল, সামরিক শাসন বা একনায়কতন্ত্র সমর্থন করে। এরফলে, প্রকৃত উন্নয়ন কর্ম ব্যাহত হয়। ঋণ এবং আর্থিক অনুদানের ফলে এশীয় এবং আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিও দ্রুত ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের আরেকটি মাত্রা হলো বহুজাতিক কোম্পানীগুলির অবাধ প্রবেশ। বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের প্রচুর মূলধন এবং উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে দেশীয় সংস্থাগুলিকে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় অবাধে হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এর পরবর্তী ধাপে তারা দেশীয় সংস্থাগুলিকে অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনে নিতে সক্ষম হয় এবং দেশীয় বাজারের উপর, একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হল, যথাসম্ভব মুনাফা বৃদ্ধি করা এবং বাজারের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। এই মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। একটি উদাহরণ দিলে, এই মুনাফার পরিমাণ সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৫০-১৯৫১ এর মধ্যে আফ্রিকায় মার্কিন বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৪৫০০ মিলিয়ান ডলার। এই বিনিয়োগের থেকে মুনাফা বা লাভের পরিমাণ হয় প্রায় ৮,৩০০ মিলিয়ন ডলার। একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, এই পরিমাণ মুনাফা সম্ভবপর ছিলো না। মার্কিনী বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ জারী করে দেশীয় অর্থনৈতিক নীতি অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে, শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশীয় সরকারের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা হয়। এটাই নব্য-ঔপনিবেশিক দেশগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন কোন দেশে সরকার শেষ পর্যন্ত নব্য-সাম্রাজ্যবাদী দেশের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে প্রথম বিশ্বের সমর্থন-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে এতটা সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে দেশীয় সরকারকে বাধ্য করা হয় এমন নীতি প্রয়োগ করতে যাতে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বা বহুজাতিক সংস্থাগুলির সুবিধা হয়। শেষ পর্যন্ত, তৃতীয় বিশ্বের এই নির্ভরতা হয়ে ওঠে অন্তহীন। যতদিন এই নির্ভরতা বজায় থাকে, ততদিন তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক দুর্বলতা বজায় থাকা অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় বিশ্বের ওপর এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের একটিগুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ ফল হলো, দেশীয় কৃষি ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনাগুলি চাপিয়ে দেবার ফলে, দেশীয় অর্থনীতি, তার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে। পুঁজি নির্ভর পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগ্রহণ করার ফলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা প্রথম থেকেই সীমিত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে, কর্মসংকোচন দেখা দেয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা, নতুন কর্মের সৃষ্টি বেশী করতে পারে না। যার ফলে জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ উন্নয়নের কোন সুফল ভোগ করে না।

একদিকে নতুন প্রকল্পগুলি বেশি মাত্রায় কর্মের চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারেনা অপর দিকে পুঁজিবাদী নীতি এবং বহুজাতিক অনুপ্রবেশ চিরাচরিত কর্মের উৎসগুলিতেও চরম আঘাত হানে। তৃতীয় বিশ্বের কৃষিক্ষেত্রে যেমন,

১৯৬০ দশকে ‘সবুজ বিপ্লব’ (Green Revolution) ঘটাবার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই পরিকল্পনা ছিলো পুরোপুরি পুঁজি নির্ভর। তাই উচ্চফলনের এই পরিকল্পনা দেশীয়কৃষি ক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক ধনী কৃষককুলের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র কৃষকেরপক্ষে এই পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। অপরদিকে, কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী পরিকল্পনা আগমনের ফলে, বহু ধনী কৃষক, খাদ্যশস্যের পরিবর্তে অর্থকারী ফসল উৎপাদন শুরু করে। এর ফলে নিম্নশ্রেণির খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যায়। যেহেতু ভারতবর্ষসহ বহু তৃতীয় বিশ্বের দেশেরসাধারণ গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে এই ধরনের খাদ্যশস্যই হলো জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন, এক বিরাট শ্রেণির কাছে খাদ্য শস্যর অপ্রতুলতা প্রধান হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে শিল্প ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির আমদানীর সঙ্গো সঙ্গো দেশীয় শিল্পে সংকোচন শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কুটীর শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যার ফলে অর্থনৈতিক সংকট আরো বৃদ্ধি পায়।

সব মিলিয়ে, নব্য-উপনিবেশবাদের মূল শোষণের ধারা হলো অর্থনৈতিক শোষণ। আমাদের এই গ্রন্থের নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের পরও কিন্তু এই ধারা অব্যাহত। ১৯৯০ সালে ঠান্ডা যুদ্ধ সমাপ্তির পর বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিশ্বায়ণ ঘটেছে, তার মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায় নব্য-উপনিবেশবাদ লুকিয়ে আছে। প্রথম বিশ্ব তৃতীয় বিশ্ব দ্বন্দ্ব আজকের সময়ে রূপ নিয়েছে, ‘উত্তর’ (North) এবং ‘দক্ষিণ’ (South)-এর দ্বন্দ্বে।

প্রথম বিশ্ব প্রভাবিত এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে, ১৯৬০’র দশক থেকেই তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর আগেই ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলন, ১৯৬১ সালে নির্জোট আন্দোলন শুরু হলে, তৃতীয় বিশ্বরাজনীতির মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করেছিলো। ১৯৬০-র দশকে ঋণ এবং অনুদানের বিরোধিতা করে, তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দাবী করতে শুরু করে। তৃতীয় বিশ্বের এই আন্দোলনের মূল রঙ্গামঞ্চও হয়ে ওঠে, রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অধিবেশন। নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর দাবী সর্বপ্রথম করা হয় ১৯৬২ সালে, রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত, বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সম্বন্ধীয় আলোচনা সভায় (United Nations Conference on Trade and Development, U.N.C.T.D.A)-এর পরে। ১৯৬৮ সালে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে, পুনরায় ওই দাবী তোলা হয়। তৃতীয় বিশ্বের নতুন অর্থনৈতিক অধিকারের দাবী সরাসরিভাবে গৃহীত না হলেও, এই প্রতিরোধের ফলে, প্রথম বিশ্ব, তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গো অর্থনৈতিক সম্পর্কর কিছু পরিবর্তন আনতে শুরু করে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক যেমন, ইন্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপ্মেন্ট এজেন্সি (International Development Agency)-নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে, যেটি অপেক্ষাকৃত কম সুদে তৃতীয় বিশ্বকে ঋণ দিতে শুরু করে। এছাড়া, গঠিত ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি (Economic Community, EEC) সুবিধাজনক শর্তে, আফ্রিকায় অবস্থিত বহু দেশকে, অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে শুরু করে। ১৯৭৪ সালে, লোম্ (Lome) শহরে গৃহীত একটি চুক্তি দ্বারা, ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি এবং এ. সি. পি. (African, Carithean and Pacific, ACP) অর্থাৎ আফ্রিকা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অবস্থিত ৪৬ দেশের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই চুক্তি ১৯৭৯ সালে পুনরায় স্বাক্ষরিত হয়। লোম্ চুক্তির ফলে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কিছু উন্নয়ন হলেও এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রথম বিশ্বের ওপর নির্ভরশীলতা কম করার লক্ষ্যে UNCTAO’র চতুর্থ সম্মেলন, আফ্রিকার নাইরোবি

শহরে, ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এবং ১৯৭৯ সালে, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম সম্মেলনে, তৃতীয় বিশ্ব এবং প্রথম বিশ্বেরদ্বন্দ্ব জোরদার হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বকে আরো প্রকট করে তোলে ১৯৭০'র দশকে ওপেক (OPEC, Organisation of Petroleum Exporting Countries) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে। ওপেকের এই সিদ্ধান্ত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সমর্থন করলেও প্রথম বিশ্বের তুলনায়, তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্তহয়। এছাড়া, এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের ভাঙন লক্ষনীয় হয়ে ওঠে, যার ফলে জোটবদ্ধ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৮০ দশকে, দ্বিতীয় বিশ্বের দুর্বল হয়ে ওঠা এবং অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই পালা বদলের ফলে, নব্য-উপনিবেশবাদের প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর, প্রথম বিশ্বের (যা এখন 'উত্তর' গোষ্ঠী বলে অধিক পরিচিত) নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত। তবে এই নিয়ন্ত্রণ এখন সরকারী ঋণদানের মাধ্যমে না হয়ে, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংগঠনগুলি এবং বহুজাতিক সংগঠনগুলি দ্বারা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বহু 'দক্ষিণ' গোষ্ঠীভুক্ত দেশ বিশ্বব্যাঙ্ক দ্বারা 'উন্নয়ন মডেল' গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই মডেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও খরচ কমানো এবং বেসরকারিকরণের মাধ্যমে, বেসরকারি (দেশী ও বিদেশী) পুঁজি বিনিয়োগ।

এর ফলে, দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত আছে। পুঁজি বিনিয়োগ সম্বন্ধীয় অনিশ্চয়তা অনেক ক্ষেত্রেই আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং দক্ষিণ আমেরিকায়, আর্জেন্টিনায়, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৫.৬ নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ঃ সংস্কৃতি

আগের অংশ পড়ে আপনারা জেনেছেন যে, নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের মূল প্রকৃতি হলো বিভিন্ন মাত্রায় অর্থনৈতিক শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণ। আপনারা এও জেনেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বিশ্বে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর ছিলো না বলেই এই পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের উদ্ভব হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও, নব্য-উপনিবেশবাদের প্রকৃত ধারা গোপন রাখা প্রয়োজনীয় ছিলো। এবং এই প্রয়োজন থেকেই শেষ পর্যন্ত জন্ম নেয় সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

নব্য-উপনিবেশবাদের প্রকৃত চেহারা গোপন রাখার প্রধান দায়িত্ব নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রথম বিশ্বের অন্যান্য দেশ নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদ মাধ্যমগুলি, যাদের প্রচার বিশ্বস্ত এবং সঠিক হিসেবে গ্রহণযোগ্য, যেমন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন বা বি.বি.সি. (B.B.C.), ভয়েস অফ্ আমেরিকা (Voice of America) বা সি.এন.এন. (C.N.N.) প্রভৃতি, কিন্তু প্রথম বিশ্বের আদর্শগত চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। ঠান্ডাযুদ্ধ চলাকালীন এই সংবাদ মাধ্যম এবং সংবাদপত্রগুলি পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় মুখর ছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত এশীয় বা আফ্রিকার, স্বৈরাচারী শক্তিগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি এদের সংবাদের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী ইউরোপীয় সমর্থিত নব্য-উপনিবেশবাদ সম্বন্ধে এরা বেশিরভাগ সময়ে নীরবতা পালন করে।

নিয়ন্ত্রিত সংবাদ ছাড়া, প্রথম বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের ওপর নিজস্ব সংস্কৃতি আরোপ করতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রেও, প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। কোয়ামে নক্রুমা, তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে কিভাবে হলিউডের তৈরী মার্কিনী চলচ্চিত্র, তৃতীয় বিশ্বের যুবক, এবং কিশোর গোষ্ঠীকে প্রথম বিশ্বের আদর্শগত ধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির সাহায্যে, এই প্রচার মাধ্যমের ক্ষমতা আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বিশ্বে, রেডিও টেলিভিশন এবং আধুনিক ইন্টারনেটের সাহায্যে, পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রসার আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে। এই সংস্কৃতির প্রভাব আর শুধু কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে নেই। আদর্শগত পরিবর্তন ছাড়া, নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখাচ্ছে যে, খাদ্যবস্তু, বেশ-ভূষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে, দেশীয় সংস্কৃতি, বিভিন্ন লোকাচার আজ অবলুপ্তির পথে। এছাড়া পশ্চিমী সংস্কৃতি, প্রথম বিশ্বের উজ্জ্বল দিকটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়। এর প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ, প্রথম বিশ্বের চিন্তাধারা এবং আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে শুরু করে। নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা বিস্মৃত হয়। এর ফলে, নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ আরো সহজ হয়ে ওঠে।

নব্য-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ অবশ্য একচেটিয়া সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তৃতীয় বিশ্বে, নব্য-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বহু জায়গায় জনমত সংগঠিত হয়েছে, নব্য-উপনিবেশবাদ আদর্শগতভাবেও মোকাবিলা করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই আদর্শগত বিরোধের অন্যতম দুটি কেন্দ্রবিন্দু হলো তৃতীয় বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং নির্জোট আন্দোলন। পরবর্তী এককে আপনারা নির্জোট আন্দোলন সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

১৫.৭ সারাংশ

তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন উপনিবেশগুলি ১৯৪৫ সালের পর স্বাধীনতা লাভ করলেও নব্য-উপনিবেশবাদ তাদের সামনে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে।

নব্য-উপনিবেশবাদ বলতে আমরা পরোক্ষভাবে, প্রথম বিশ্বের দেশগুলির দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণের কথা বলি। এই নিয়ন্ত্রণের প্রধান হলো, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক।

নব্য-উপনিবেশবাদের প্রথম প্রসার দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, মার্কিন আধিপত্য বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অনেক সময়, নতুন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা আই. এম. এফ. এই বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য হয় মুনাফা বৃদ্ধি, কিন্তু এর ফলে দেশীয় আর্থিক পরিকাঠামো অনেক ক্ষেত্রে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নব্য-ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধিতা করে তৃতীয় বিশ্বে দুটি নির্দিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে। সে দুটি হলো, সমাজতন্ত্র এবং নির্জোট আন্দোলন।

১৫.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. নব্য-উপনিবেশবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কিভাবে গড়ে উঠেছিল?
বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে এই ধারার কিভাবে ব্যাপ্তি হোল?

২. নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৩. ‘সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ’ মানে কী?
তৃতীয় বিশ্বে এর প্রভাব কিভাবে বাড়ছে?

৪. ‘কোয়ামে নক্রুমা’ কে ছিলেন?

৫. নব্য-উপনিবেশবাদ নিয়ে লেখা তিনটি গ্রন্থ এবং লেখকদের নাম লিখুন।

১৫.৯ উত্তরমালা

১৫.৩ প্রশ্নের উত্তর — ১৫.৩ অংশটি দেখুন।

১. ১৫.৪ অংশটি দেখুন।

২. ১৫.৫ অংশটি দেখুন।

৩. ১৫.৬ অংশটি দেখুন। (আপনি আরো দু-একটি উদাহর খুঁজে দেখতে পারেন।)

৪. ১৫.৩ অংশটি দেখুন। (আপনি নিজে আরো উদাহরণ দিতে পারেন)।

১৫.১০ অনুশীলনী

১৫.১০.১ নব্য-মার্কসীয় ‘নির্ভরতা তত্ত্ব’ বলতে কি বোঝেন?

১৫.১০.২ অধুনা বিশ্বায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে, নব্য-উপনিবেশবাদ কিভাবে বিস্তারিত হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?

১৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১. কোয়ামে নক্রুমা — ‘নিও-কলোনিয়ালিজম্’ ঃ দ্য লাস্ট স্টেজ অফ্ ইম্পিরিয়াজম। নেলসন পাবলিশার্স, ১৯৬৫।

২. ফ্রানজ ফ্যানন — ‘দ্য রেচেড্ অফ্ দি আর্থ’ (১৯৭৪)।

একক ১৬ ❑ নির্জোট নীতি (The Policy of Non-Alignment)

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য
১৬.২ প্রস্তাবনা
১৬.৩ বিশ্বরাজনীতির পটভূমি
১৬.৪ নির্জোট নীতি ঃ প্রকৃতি
১৬.৫ নির্জোট নীতি নির্ধারণে জওহ্রলাল নেহ্রুর ভূমিকা
১৬.৬ নির্জোট আন্দোলনের উদ্ভব এবং প্রসার—একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা
১৬.৬ ১ প্রসার এবং কার্যকলাপ
১৬.৭ নির্জোটনীতির ভবিষ্যৎ
১৬.৮ সারাংশ
১৬.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১৬.১০ উত্তরমালা
১৬.১১ অনুশীলনী
১৬.১২ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি যে বিষয়গুলি জানতে পারবেন, সেগুলি হলো ঃ

- ১৯৪৫ সালের পর বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট।
- ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব।
- নির্জোট নীতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি।
- নির্জোট নীতি রূপায়ণে নেহ্রুর ভূমিকা।
- নির্জোট নীতির উদ্ভব ও বিকাশ।
- নির্জোট নীতির ভবিষ্যত।

১৬.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু এই স্বাধীনতা, অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি, তৃতীয় বিশ্বের প্রাক্তন উপনিবেশগুলির ওপর, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নীতি প্রয়োগ করে, পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

এর আগের এককটিতে আপনারা, নব্য-উপনিবেশবাদের মাধ্যমে এই ধরনের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের কথা পড়েছেন। এছাড়া বিশ্ব রাজনীতিতে ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের সঙ্গে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশ্বের সমস্ত দেশকে, এক গোষ্ঠী নয়ত অপর গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট হয়।

ঠান্ডা যুদ্ধ এবং নব্য উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা হল নির্জোট আন্দোলন। এর অন্যতম প্রধান রূপকার ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

এই এককের অন্যান্য অংশে নির্জোট নীতির উদ্ভব, প্রকৃতি এবং বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬.৩ বিশ্বরাজনীতির পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে, বিশ্ব রাজনীতিতে এক সংকটময় পরিস্থিতির সূচনা হয়। মিত্র শক্তি, গোষ্ঠীর দ্বারা, জার্মানীর নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলেও, মিত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলির অর্থনৈতিক অবস্থান ঘটে। এর ফলে, ১৯৪৫ সালের পর বিশ্ব রাজনীতিতে, ইউরোপীয় শক্তিগুলির আধিপত্যের অবসান হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়, দুই নতুন শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রচেষ্টা, বিশ্ব রাজনীতিতে এক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি করে যাকে ঠান্ডা যুদ্ধ বা 'Cold War' বলে অভিহিত করা হয়।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, দুটি দেশেরই নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির ওপর নিজস্ব কর্তৃত্ব স্থাপিত করে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সরাসরি না হলেও বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং আর্থিক অনুদানের (যেমন, মার্শাল পরিকল্পনা) সাহায্যে, পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে নিজস্ব আধিপত বিস্তারে সচেষ্ট হয়। অচিরেই, এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরো বৃদ্ধি পায়, যখন মার্কি:ন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয় দেশই, সামরিক সংঘ গঠনে সচেষ্ট হয়। মার্কিন চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, 'উত্তর অতলান্তিক সংঘ বা North Atlantic Organisation (NATO) স্থাপিত হয় ১৯৪৯ সালে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর প্রত্যুত্তরে গঠন করে ওয়ার্শ (Warshaw Pact) গোষ্ঠী। সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ইউরোপেই আবদ্ধ থাকে না। এশিয়া মহাদেশে মার্কিনী মদতে তৈরী হয় দুটি নতুন সামরিক সংগঠন, 'কেন্দ্রীয় চুক্তি সংঘ্য' বা 'সেণ্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন' (Central Treaty Organisalion CENTO) এবং 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংঘ' বা 'সাউথ-ইষ্ট এশিয়া ট্রিটী অরগানাইজেশন' (South East Asia Treaty Organisation, SEATO)।

এছাড়া, উভয় দেশই, আর্থিক অনুদান, সামরিক সাহায্য এবং অন্যান্য নীতির মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত বা উন্নয়নশীল, সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াবার লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়।

ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম পরিবর্তন হলো এশিয়া, আফ্রিকার, বহু ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও, তাদের আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, প্রথম বিশ্ব এবং দ্বিতীয় বিশ্ব তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া ঠান্ডা যুদ্ধের আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশগুলিকে এক বা অপর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

ঠান্ডা যুদ্ধ এবং গোষ্ঠীকরণ নীতির বিরোধিতা করে, তৃতীয় বিশ্বে, এক শক্তিশালী প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে যার নাম, নির্জোট আন্দোলন। এর অন্যতম রূপকার ছিলেন জওহরলাল নেহরু।

প্রশ্নাবলী ঃ

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কী ঘটেছিলো?

২. কত সালে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়?

১৬.৪ নির্জোট নীতি ঃ প্রকৃতি

তৃতীয় বিশ্বে, নির্জোট আন্দোলন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে রাজনীতি—বিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রথম দিকে এই নীতিকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেছিলো। এই নীতির অনেক অপব্যাখ্যাও লক্ষ্য করা যায়। পিটার ক্যালভোকোরেসী (Peter Calvocoressi) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'ওয়ার্ল্ড পলিটিকস সিন্‌স ১৯৪৫' (World Politics Since 1945) বা, ১৯৪৫ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতি-তে নির্জোট নীতিকে নিরপেক্ষনীতি বা নিউট্রালিজম (Neutralism) বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে আবার একে সুবিধাবাদী নীতি বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু নির্জোট নীতির রূপকারেরা এই নীতিকে কখনোই নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় নীতি হিসেবে প্রচলিত করতে চাননি। নিরপেক্ষ নীতির অন্যতম রূপকার, নেহরু এই প্রসঙ্গে, ১৯৪৯ সালে, মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া এক ভাষণে, বলেন, "...... আমাদের নীতি নিরপেক্ষ নয় বরং আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা শান্তি রক্ষা বা যদি সম্ভব হয়, শান্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা......।"

('..........our Policy is not neutralist but one of active endeavour to preserve, and if possible, establish peace on firm foundation')। তথ্যসূত্র ঃ এস. এন. ধর—ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড ওয়ালর্ড পলিটিকস্ সিনস্ ১৯১৯। (পৃ. ৪৮৩)(Source : 'S. N. Dhar – International Relations and World Politics since 1919' (P 483)।

নির্জোট নীতিকে তাই একটি ইতিবাচক নীতি হিসেবে অভিহিত করা যায়। যার প্রয়োগের ফলে একটি রাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে স্বাধীন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং বিভিন্ন ঘটনার ওপর নিজের স্বাধীন মতবাদ এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়।

নির্জোট নীতির মূল কিছু বৈশিষ্ট্য হলো —

প্রথমত, নির্জোট নীতির মূল লক্ষ্য হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত, কোন গোষ্ঠীরই সদস্যপদ গ্রহণ না করে, বিশ্ব রাজনীতিতে স্বাধীনভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া। নির্জোট নীতি মূলত কোন সামরিক গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার বিরোধিতা করে। ১৯৫০ এর দশকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক সংঘগুলির সদস্য ছিলো প্রায় চল্লিশটি দেশ। অপরদিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন সদস্য দেশগুলির সংখ্যা ছিলো এগারো। নির্জোট নীতি এই ধরনের সামরিক সংঘের বিরোধিতা করে কারণ, এর ফলে বিশ্ব শান্তির প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, নির্জোট নীতির লক্ষ্য ছিলো বিদেশ - নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হলে এই স্বাধীনতা কোন দেশের পক্ষে বজায় রাখা সম্ভবপর ছিলো না।

তৃতীয়ত, নিরপেক্ষ নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিলো, পারস্পরিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে, ঠান্ডা যুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত দ্বন্দ্বমূলক আন্তর্দেশীয় সম্পর্কের পরিবর্তে, বিশ্ব শান্তি এবং সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন।

১৬.৫ নির্জোট নীতি নির্ধারণে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা

নির্জোট নীতি রূপায়ণ এবং আন্দোলন গঠনে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭-১৯৬৪ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী হিসেবে ভারতের বিদেশ-নীতি নির্ধারণে, নেহরু একটি নির্দিষ্ট ঘরানা সুস্পষ্ট করে যান। ভারতকে তিনি কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে ভারতবর্ষের মতন একটি বিশাল এবং বহুত্ববাদী দেশের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট সামরিক গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া সম্ভবপর ছিলো না। তাই প্রথম থেকেই নেহরু, বিদেশীনীতির ক্ষেত্রে, স্বাধীন চিন্তাধারার পক্ষপাতী ছিলেন।

নেহরু শুধু নিজের দেশের ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত থাকেননি। বরং এই নীতিকে কেন্দ্র করে তিনি এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিকে সংঘবন্ধ করার প্রচেষ্টা চালান, যা শেষ পর্যন্ত জন্ম দেয় তৃতীয় বিশ্বে, নির্জোট আন্দোলনের। পিটার ক্যালভোকোরেসীর মতে, মূলত, ভারতের মতন বৃহৎ দেশের নেতৃত্বের ফলেই, বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে, তৃতীয় বিশ্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নেহরুর মতে, নির্জোট নীতি হলো একটি ইতিবাচক এবং গতিশীল নীতি। এছাড়া এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিলো সামরিক গোষ্ঠী গঠনের বিরোধিতা করা, অন্যান্য ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নয়। ১৯৫৮ সালে, ভারতীয় লোকসভায় দেওয়া একটি ভাষণে, নেহরু বলেন। "........আমরা যখন বলি যে আমাদের নীতি হলো নির্জোট নীতি, আমরা নিশ্চিত ভাবে, সামরিক জোটের থেকে নির্জোট থাকার কথা বলি। এটি কোনো নেতিবাচক নীতি নয়। বরং, এটি একটি ইতিবাচক এবং সুস্পষ্ট নীতি আর আমার বিশ্বাস, গতিশীলও... ..."।

"When we say our policy is one of non-alignment, obviousky we mean no alignment with military blocs. It is not a negative policy. It is positive one, a definite one and, I hope, a dynamic one." আপ্পাদোরাই এ্যান্ড এম.এস. রাজন—'ইন্ডিয়ান্স ফরেন পলিশি এ্যান্ড রিলেশন্স (পৃ. ৩৯)। সাডথ এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

নেহরু নির্জোট নীতিকে, নিরপেক্ষ নীতি বলে অভিহিত করবার প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৬০ সালে লোকসভায় প্রদত্ত আরেকটি ভাষণে, নেহরু বলেন —

".... .... আমি বার বার বলেছি যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষ' শব্দটির ব্যবহার আমার পছন্দ হয় না। কোন কোন দেশে ভারতের নীতিকে যে 'ইতিবাচক নিরপেক্ষতা' বলে অভিহিত করা হয়, এটাও আমার পছন্দের নয়, নিঃসন্দেহে, আমরা কোনো জোটভুক্ত নই, আমরা কোনো সামরিক জোটের প্রতি দায়বন্ধ নই, কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, আমরা বিভিন্ন নীতি, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য এবং নিয়মের প্রতি দায়বন্ধ... ...।"

"... ... ... As I have said repeatedly, I do not like the word neutral" as being applied to India. I do not even like India's policy referred to us "positive neutrality" as is done in some countries. Without doubt, we are unaligned, we are uncommitted to military blocs ; but the important fact is that we are committed to various policies,

various urges,. various objectives, and various principles... ...” আপ্পাদোরাই এ্যান্ড এম.এস.রাজন—‘ইন্ডিয়ান্স ফরেন পলিসি এ্যান্ড রিলেশন্‌স (পৃ. ৩৯)। সাউথ এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

নেহরুর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্ব ঐক্য আন্দোলনের প্রচেষ্টা গতিশীল হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৯ সালে, নেহরু নতুন দিল্লীতে দুটি এশিয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। এছাড়া, ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলন নেহরু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুগোশ্লোভিয়ার নেতা টিটো এবং মিশরের নেতা নাসেরের সঙ্গে, নেহেরু ছিলেন, ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত, প্রথম নির্জোট সম্মেলনের (বেলগ্রেড) অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

১৬.৬ নির্জোট আন্দোলনের উদ্ভব এবং প্রসারের একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা

তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, একটি ঐক্য আন্দোলনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। নেহরুর নেতৃত্বে যেমন, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৯ সালে, নতুন দিল্লীতে দুটি এশীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রথমটি, অনুষ্ঠিত হয়, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে, ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে। প্রথম সম্মেলনে, আঠাশটি (২৮) এশীয় দেশ থেকে আগত সদস্যেরা অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিলো সদ্যগঠিত রাষ্ট্রসংঘে, এশীয় দেশগুলিকে ভূমিকা সম্বন্ধে যৌথ নীতি গ্রহণ করা।

নতুন দিল্লীতে, দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে। এই সম্মেলনে, এশীয় বহু দেশ ছাড়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড থেকে পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। এই সম্মেলনে, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ বা ওলন্দাজ আগ্রাসনের নিন্দা করা হয় এখানের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়।

১৯৫০-এর দশকে, তৃতীয় বিশ্বের ঐক্য আন্দোলনের প্রয়োজন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঠান্ডা যুদ্ধ নির্ধারিত সামরিক সংঘগুলি এশিয়াতেও গড়ে উঠতে শুরু করে। ভারত সহ অন্যান্য নির্জোটপন্থী দেশ, এই প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করে। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় চুক্তি সংঘ বা সেন্ট্রাল ট্রিটী অরগানাইজেশনের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, ভারত তার নির্জোট নীতি অবলম্বন করে চলায় অবিচল থাকে। এছাড়া নেহরু, চীনের নবগঠিত, কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে, ১৯৫৪ সালে পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। ঠান্ডা যুদ্ধ এশিয়া এবং আফ্রিকায় আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায়, ১৯৫৪-৫৫ সালে, একটি আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই সিদ্ধান্তর রূপায়ণ ঘটে বান্দুং-এ (Bandung) অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন নেহরু এবং ইন্দোনেশিয়ার নেতা, সুকর্ণ। মোট উনত্রিশটি দেশ (২৯) এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে, আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করে ছটি দেশ, যথা মিশর, লিবিয়া, সুদান, ইথিওপিয়া, লাইবেরিয়া এবং ঘানা।

বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরবর্তী পর্যায়ে, আরো অনেক দেশ, এই আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে, আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করে ছটি দেশ, যথা মিশর, লিবিয়া, সুদান, ইথিওপি য়া, লাইবেরিয়া এবং ঘানা।

বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরবর্তী পর্যায়ে, আরো অনেক দেশ, এই আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নাসেরের নেতৃত্বে মিশর এবং টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লোভিয়া। মূলত নেহরুর

প্রচেষ্টায়, চীনকেও এই আন্দোলনের অংশীদার হবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। ব্রিয়োনীতে (Brioni) অনুষ্ঠিত এক আলোচনায়, নির্জোট দেশগুলির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রথম নির্জোট সম্মেলন, যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেড শহরে, ১৯৬১ সালে, অনুষ্ঠিত হয়।

১৬.৬.১ প্রসার এবং কার্যকলাপ

নির্জোট আন্দোলনে, তৃতীয় বিশ্বের ঐক্য, বিশ্ব রাজনীতিতে শান্তি স্থাপন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেছেন।

নির্জোট আন্দোলন, বিশ্ব রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে জন্ম নেয়। একদিকে, তৃতীয় বিশ্বের আবির্ভাব ও অপরদিকে, ঠান্ডা যুদ্ধ সংক্রান্ত অস্থিরতা। এই পরিস্থিতিতে, নির্জোট আন্দোলন এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে, নির্জোট আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে রাজনীতি বেশী গুরুত্ব লাভ করে। নির্জোট সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হয়, ঠান্ডা যুদ্ধ তৈরী, বিশ্ব রাজনীতির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের বিরোধিত করা। অপরদিকে, উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদ, প্রথম বিশ্বের দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের উপর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি, বিষয়ের ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৬৪ সালে, মিশরের কায়রোয় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে, ৪৭টি সদস্য দেশ, নব্য-উপনিবেশবাদ এবং তৃতীয় বিশ্বে বিদেশী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করা নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন জানানো, এমন কিছু আন্দোলন হলো ১৯৪৭-৪৯ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন।

(খ) ১৯৪৯-৫২ পর্যন্ত লিবিয়া, এরিট্রিয়া এবং ইতালিয় সেমালিল্যান্ডের আন্দোলন।

(গ) ১৯৫১-৫৬ মরক্কোয় আন্দোলন।

(ঘ) ১৯৫২-৫৬ তিউনিশিয়ার আন্দোলন।

(ঙ) ১৯৫৫-৬০ আলজেরিয়ার আন্দোলন।

(চ) ১৯৫৬-৬০ সাইপ্রাসের আন্দোলন।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধেও নির্জোট আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারত যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার 'এ্যাপারাথাইড' (Apartheid) নীতির বিরুদ্ধে, কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেদ করে। এই সম্পর্ক দীর্ঘকাল পরে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক এই নীতি বর্জনের পরে, আবার স্থাপন করা হয়। ১৯৫২ সালে ভারতসহ ১৩টি তৃতীয়. বিশ্বের রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে,. রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে অভিযোগ জানায়।

নির্জোট দেশগুলির পক্ষ থেকে, বিশ্বরাজনীতিতে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয় দেশকেই তারা বারবার ঠান্ডা যুদ্ধ বন্ধ করবার আবেদন জানায়। নির্জোট দেশগুলি, এছাড়া, বিভিন্ন পর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন বন্ধের পক্ষে জোরদার সওয়াল করে। প্রকৃতপক্ষে, এর ফলে ঠান্ডা যুদ্ধ বন্ধ না হলেও, নির্জোট আন্দোলনের এই পদক্ষেপগুলি বিশ্ব রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র ধারার উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হয়।

১৬.৭ নির্জোট নীতির ভবিষ্যত

আমাদের নির্দিষ্ঠ সময় সীমার বাইরে হলেও, নির্জোট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। ১৯৬১ সালের প্রথম সম্মেলনের পর অনেক বছর কেটে গেলেও,. নির্জোট আন্দোলন, তার গুরুত্ব হারায়নি। ১৯৭০ এবং ১৯৮০ দশকে, নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তৃতীয় বিশ্বের শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক অধিকার। এর অন্যতম লক্ষ্য হয় নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New International Economic Order, NIEC) স্থাপন করা।

এই লক্ষ্যে নির্জোট সদস্য ভুক্ত দেশগুলি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে তাদের দাবি জানিয়েছে। এগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনাইটেড নেশন্‌স কনফারেন্স অন ট্রেড ডেভেলপমেন্ট (United Nations conference of Trade and Development, UNCTAD) এছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নিয়ে গঠিত, অর্থনৈতিক সংগঠন জি-৭৭ (G-77) গঠনেও, নির্জোট গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক স্তরে, নতুন অর্থনৈতিক সংগঠন পরিকল্পনা, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও রাজনীতির ইতিহাসে, এটা ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

১৯৯০ সালের পর বিশ্ব রাজনীতির নতুন প্রেক্ষাপট নির্জোট নীতি সম্বন্ধে আবার নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, নির্জোট নীতি কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম বিশ্ব-তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্ক তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, এই সম্পর্ক নবরূপে, উত্তরে (North) এবং দক্ষিণ (South) সম্পর্ক হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক শোষণ, নব্য-উপনিবেশবাদ ইত্যাদি বিষয় আজো সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশ্ব রাজনীতির নতুন প্রেক্ষাপটে, তাই নির্জোট আন্দোলন, দক্ষিণ গোষ্ঠীর দেশগুলির অন্যতম নীতি হয়ে উঠতে পারে।

ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে, নির্জোট আন্দোলন, তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্তে, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি আরো গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পর, প্রথম নির্জোট শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৯২ সালে, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয়। এবং সম্মেলনেই. নির্জোট আন্দোলনের নতুন কর্মসূচির খসড়া গৃহীত হয়। নতুন খসড়ায় তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাগুলির সমাধান এবং প্রথম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা, পুনরায় বলা বলেও, বিশ্বব্যাপী নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে, প্রথম বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত সংগঠনগুলির সঙ্গে, সহযোগিতার কথা বলা হয়। এই সহযোগিতা অবশ্য তখনই সম্ভব, যখন, দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা লাভে সক্ষম হবে। এই লক্ষ্যে, নির্জোট আন্দোলন পুনরায় দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সম্বন্ধ বাড়াবার আবেদন জানায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত শেষ নির্জোট সম্মেলন (১৯৯৮), ‘দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা পুনরায় বলা হয়েছে। উত্তর গোষ্ঠীর দেশগুলির বিরুদ্ধে, আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাও এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। নব্য-উপনিবেশবাদ এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, অন্যান্য বিষয় যেমন, প্রাকৃতিক দূষণ রোধে যৌথ প্রচেষ্টা উত্তর গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।’

উত্তর দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অন্যতম সংগঠন হিসেবে, নির্জোট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে।

১৬.৮ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট ছিলো ঠান্ডা যুদ্ধ নির্ধারিত। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব হলে, এরা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

তৃতীয় বিশ্বের একটি স্বতন্ত্র পথের সন্ধান দিতে উদ্ভব হয় নির্জোট নীতির। নির্জোট নীতি কোনো নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় নীতি নয়, এটি একটি ইতিবাচক নীতি, যা প্রথম বিশ্ব বা দ্বিতীয় বিশ্বের কোন সামরিক সংঘের অর্ন্তভুক্ত হবার বিরোধিতা করে। নির্জোট নীতির প্রধান রূপকারেরা হলেন, নেহরু, নাসের, সুকর্ণ এবং টিটো।

এঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু ছিলেন এই নীতির প্রথম ও প্রধান রূপকার। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায়, নির্জোট আন্দোলন, তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যলাভের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

নির্জোট আন্দোলন উদ্ভবের লক্ষ্যে অন্যতম গুরত্বপূর্ণ ছিলো ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলন। এর কিছু পরে ১৯৬১ সালে, বেলগ্রেডে নির্জোট সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘ সময় ধরে নির্জোট আন্দোলন বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯০-এ ঠান্ডাযুদ্ধ বন্ধ হবার পরও এই প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। অধুনা 'দক্ষিণের' দেশগুলির কাছে, নির্জোট আন্দোলন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৬.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. নির্জোট নীতিকে কী আপনি নিরপেক্ষ নীতি বলবেন?
২. নির্জোট নীতির রূপকার হিসেবে নেহরুর ভূমিকা কী ছিলো?
৩. তৃতীয় বিশ্ব ঐক্য সাধনে, নির্জোট নীতির ভূমিকা কী ছিলো?
৪. নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুটি এশীয় সম্মেলন (১৯৪৭, ১৯৪৯) সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
৫. প্রথম নির্জোট সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

১৬.১০ উত্তরমালা

১৬. ৩ প্রঃ (১) ১৬.৩ অংশ দেখুন। (২) ১৯৪৯ সালে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. ১৬.৪ অংশটি দেখুন।
২. ১৬.৫ অংশটি দেখুন।
৩. ১৬.৬.২ অংশটি দেখুন।
৪. ১৬.৬.১ অংশটি দেখুন।
৫. বেলগ্রেড (যুগোশ্লাভিয়া), ১৯৬১ সালে।

১৬.১১ অনুশীলনী

১. নির্জোট নীতিকে কি 'ইতিবাচক নিরপেক্ষ' নীতি বলে আপনি অভিহিত করবেন?

২. বর্তমান যুগে নির্জোট আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা কী বলে আপনি মনে করেন। (আপনি নিজে আরো উদাহৃরণ দিতে পারেন।)

১৬.০ নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

১. পিটার ক্যালভোকোয়েসী — 'ওয়ালর্ড পলিটিক্স সিনস্ ১৯৪৫' (১৯৬৮)।
২. অ. আপ্পাদুরাই এবং এম. এস. রাজন 'ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসী এ্যান্ড রিলেশন্স' (১৯৮৫)।